মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নগর জীবন ও নগর রাষ্ট্র

- দেবার্ক মণ্ডল, গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

This paper explores the representation of urban life and the concept of city-states in medieval Bengali literature. While medieval Bengal is often viewed through the lens of agrarian and rural society, literary texts from the period reveal nuanced portrayals of urban centres, marketplaces, administrative hubs, and royal cities. Through an analysis of key texts—ranging from Mangal-kavyas and Vaishnava literature to Islamic narrative poetry—this study uncovers how cities functioned not only as political or economic entities but also as symbolic spaces reflecting social hierarchies, cultural exchanges, and moral tensions. The paper aims to re-evaluate the socio-political imagination of urbanity in medieval Bengali literary tradition and contribute to a broader understanding of pre-modern urban consciousness in South Asia.

Keywords: Medieval Bengali Literature, Urban Life, City-State, Mangal-kavya, Pre-modern Urbanism, Cultural Representation, Socio-political Imagination, South Asian Cities, Literary Urbanity, Bengal History

সাধারণত ‘আধুনিক’ এই বিশেষণে আমাদের সামনে কোন কৃষি নির্ভর গ্রাম্য জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে আসে না। বলা যায় প্রাচুর্যময়, প্রতুলতাপূর্ণ বৈভবের ধারণা আমরা সহজেই আঁচ করে নিতে পারি ‘আধুনিক’ শব্দবন্ধ থেকে। তবে এই প্রাচুর্যের সাথে নগর রাষ্ট্র বা নগর জীবনের আবশ্যিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক সামগ্রিক কালব্যাপী নগর রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে যে প্রাচুর্যের, বৈভবের আঁচ করা যায় তার সাথে স্বভাবতই আধুনিকতার একটা মনোভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। এদিক থেকে আধুনিকতাকে কোন কালগত সীমাবদ্ধতায় না রেখে একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা মেজাজ বলাই সুবিধাজনক। যে কারণে হাজার বছরেরও বেশি আগের চীনের কবি ‘লি-পো’-কে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি বলে ভাবতে পেরেছিলেন।[১]

মধ্যযুগে যখন বাংলা সাহিত্য লেখা হচ্ছে সেই সময়কার সাহিত্য সৃষ্টির রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য সৃষ্টি, অধিকন্তু সাহিত্যের সৃজন প্রক্রিয়া থেকে এই যুগের (মধ্যযুগের) নগর জীবন, নগরায়ণ ও নাগরিকতা সম্বন্ধে আমরা বৈজ্ঞানিক ভাবে শতভাগ প্রমাণিত নাহলেও যুক্তিগ্রাহ্য বহু সাহিত্যিক নির্দশন খুঁজে পাই। মধ্যযুগে সাধারণত কবিরা তাঁদের সাহিত্য বা সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য কোন না কোন পৃষ্ঠপোষকের উপর নির্ভর করতেন। মধ্যযুগের সমস্ত কবিরাই যে পৃষ্ঠপোষক নির্ভর ছিলেন তা বলা যায়না। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষক নির্ভর সাহিত্য রচনায় অনুগৃহীত কবি কোন রাজা বা পৃষ্ঠপোষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তৎকালীন নগর জীবন ও নগর রাষ্ট্রের একাধিক বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনাসূত্রে অনেক সময়ই বাংলার রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক অবস্থা আমাদের সামনে নানা তত্ত্ব ও তথ্যের আকারে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উঠে এসেছে। অন্ধকার যুগের পর সাধারণত ১৫শ থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে বাংলার মধ্যযুগ হিসেবে ধরা হয়। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা প্রদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে মুঘল শাসনাধীনে বাংলার রাজনীতি, ধর্মনীতি ও রাজস্বনীতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে মুসলিমরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজস্ব

বা কর আদায়ের জন্য মোঘল শাসকরা বেশ কিছু সুবাদারদের উপর নির্ভর করতেন। আর এই সুবাদাররা মোঘল শাসক আর বাংলার জনগন তথা শাসক গোষ্ঠীর মাঝে মধ্যসত্ত্বভোগির মতো কাজ করতেন। যার কারণে মোঘল সম্রাটদের ছত্রছায়ায় এই সুবাদারদের বাড়বাড়ন্ত কম ছিলনা। যেমন সুবাদার 'ফিদাই খান' সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর আগের বছর থেকে অর্থাৎ ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সম্মানে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা নজরানা হিসেবে দেওয়ার রীতি চালু করেন।[২] বলাবাহুল্য এই নজরানার জোগান হত সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই। অনুমান করা হয় বাংলাদেশের মানুষ সবথেকে বেশি শোষিত হয়েছিল নবাব 'শায়েস্তা খান' -এর রাজত্বকালে। এই সময় 'ঔরঙ্গজেব' -এর দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের খরচ চালানোর জন্য বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হত যা 'খরচ-ই-য়িসাক' নামে ইতিহাসে পরিচিত। 'শায়েস্তা খাঁ' দ্বিতীয়বার বাংলার সুবাদার হয়ে এসে ১৬৮০ সালে ঔরঙ্গজেবকে সাত লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন।[৩] যে ঋণ কোনকালেই পরিশোধ করা হয়নি। এভাবেই সুবাদাররা নানাভাবে মোঘল সম্রাটকে যেমন উৎকোচ এর প্রাচুর্য দিয়ে ভরিয়ে রাখত তেমনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের প্রয়োজনেও তারা (সুবাদাররা) জনগনকে শোষণ করত। যেমন শায়েস্তা খাঁ ব্যক্তিগতভাবে আটত্রিশ কোটি টাকা নিজের ভান্ডারে সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়াও নানাসময়ে নিজেদের প্রয়োজনে এই সুবাদাররা জনগনের উপর অত্যাচার করত।

জনগণকে এভাবে নানা উপায়ে করভারে জর্জরিত করে শোষণের বৃত্তান্ত আমাদের নানা মঙ্গল কাব্যের সূত্রে জানা যায়। প্রসঙ্গত ধর্মমঙ্গল- এর অন্যতম কবি 'রামদাস আদক' যথাসময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় তিনি তিনদিন কারাগারে বন্দী দশা ভোগ করেন –

> রামদাস জাতে কৈবর্ত, পিতার নাম রঘুনন্দন। তাদের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার ভূরশূট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে। পৌষের কিস্তি দিতে না পারায় পরগণার জমিদারের কর্মচারী রামদাসকে কয়েদ করে। [৪]

আসলে মুঘল সম্রাটদের নামে রাজ্য শাসিত হলেও জনগণকে মূলত রাজকর্মচারীদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। এই রাজকর্মচারি বা সুবাদাররাই ছিল জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাংলার সমস্ত পরগণায় মধ্যযুগের নবাবি আমলে জমিদার, জায়গীদার, আমিন, শিকদার, ডিহিদার আর এদের অধীনস্থ কর্মচারিরাই ছিল সাধারণ প্রজাদের ভাগ্য-বিধাতা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাগরিক জীবনের যে সম্পদ-বৈভবের উল্লেখ আছে তার অন্যতম ভিত্তি বলা যায় সমাজের বণিক শ্রেণী বা বাণিজ্য। পালবংশের রাজত্বকালে আরবীয় বণিক 'সুলেমান' ভারতবর্ষে আসেন সম্ভবত ৮৫১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ।[৫] তাঁর (সুলেমান) লেখায় বাংলার উৎকৃষ্ট দ্রব্য মসলিন কাপড়ের উল্লেখ রয়েছে। জানা যায় এই সময় বাংলার বাজারে জিনিস পত্রের লেনদেনের জন্য কড়ির প্রচলন ছিল। পর্যটক 'আলবেরুনী'র রচনা (কিতাব-উল-হিন্দ্) থেকেও জানা যায় দশম-একাদশ শতকে বাংলার বাণিজ্য আর্থিকভাবে প্রাচুর্যময়, স্বচ্ছলতাই ছিল। তাই মঙ্গলকাব্যের অনেক নগরজীবনের বর্ণনায় নাগরিকতা ছিল বাণিজ্য ভিত্তিক। যেমন আমাদের অতি পরিচিত মনসামঙ্গলে চাঁদ সওদাগরের জীবন ও ঘটনা প্রবাহ ছিল বানিজ্য কেন্দ্রিক –

> খড়দহে শ্রীপাটে করিয়া দণ্ডবত। বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত।।
> রিসিড়া ডাইনে বাহে বামে সুকচর। পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর।।

ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে। পূর্বেতে আঁড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে।।
চিতপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা। নিসি দিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা।।
পূর্বে কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা। বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা।। [৬]

যদি একটা দেশ বা সমাজের মধ্যে সম্পদ বা উপাদান,উপকরণের সম বন্টন হয় তাহলে আলাদা করে গ্রাম-শহর-নগরের জীবনযাত্রার গুনমানে তেমন ভিন্নতা থাকতনা। নগর জীবন বলতে বার বার যে প্রাচুর্যের কথা বলা হচ্ছে সেই প্রাচুর্যের স্বরূপ নানাবিধ হতে পারে। হয়ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের, কর্মসংস্থানের, বাণিজ্যের নানা দিক থেকে একটা নগর সম্বৃদ্ধশালী হতে উঠতে পারে। কিন্তু নগরের সীমাকৃত অঞ্চলে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ না হয়ে তা যদি দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্রের মানুষের কাছে সর্বত্র সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে যায় তাহলে আলাদা করে কোন নাগরিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না। যেমন 'চণ্ডীমঙ্গল' -এর আখেটিক খন্ডের কালকেতুর 'গুজরাট-স্থাপনের উদ্যোগ; নগরস্থাপন' পালায় আছে 'বেরুনিঞ্চা' গণের আগমনের কথা বা নগর পত্তনের কাহিনী–

মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুনিঞ্চা জন
আইসে তারা নানা দেশ হইতে
কাঠদা কুঠারি বাসী টাঙ্গী কিনে রাশি রাশি
কিনে বীর সভাকরে দিতে।
উওরদেশের জন নামে আইসে দামুগণ
শতেক জনের আগুয়ান
বেরুনিঞ্চা দেখি বীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিল গুয়া পান। [৭]

গাছ কেটে এই নগর নির্মাণের কাজে একে একে ঠিকাদার, সরদার বা সরকার হিসেবে নানা মানুষ গুজরাট নগরে এসে জড়ো হয়। এই সব মানুষদের গুজরাটে আসার বড় কারণ ছিল লভ্য টাকার আকর্ষণ। আর্থিক সংস্থান, কাজকর্ম বা ভাগ্যান্বেষণের জন্য অনেকেই এভাবে গুজরাট নগরীতে এসে জড়ো হয়।

বর্তমান সময়ের আধুনিক মনোবৃত্তিতে যে ভালো থাকা বা স্বচ্ছলতার কথা বলা হয়ে থাকে সেখানে ভালো থাকা মানে নেতিবাচক দিক থেকে অনেক সময় তা বিলাস-ব্যসনের প্রতিযোগিতা তৈরি করে। এই প্রতিযোগিতামূলক ভোগ-তৃষ্ণার অকুণ্ঠ আয়োজন মধ্যযুগের নগর জীবনে প্রভূত পরিমানে ছিল। তবে বর্তমান সময়ের মতো মধ্যযুগীয় চিন্তন প্রক্রিয়ায় নাস্তিকতার প্রাধান্য ছিল না। হনুমান, বিশ্বকর্মা, দারুব্রহ্মা এনাদের সহায়তায় কালকেতু তার সাতমহলা প্রাসাদ ও এই প্রাসাদের সপ্তম মহলে দেবী চণ্ডীর পূজা গৃহ নির্মান করেছিলেন, যা ছিল নাগরিক জীবনের প্রভুত প্রাচুর্যের ইঙ্গিত –

দেবকারু বিশ্বকর্মা তার পুত্র দারুব্রহ্মা
শিরে ধরে চণ্ডিকার পান
সঙ্গে জাতি বন্ধু নাতি উজাগর দিনরাতি
নানাচিত্র করত্র নির্মাণ।
হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চির

শিলা তরু পর্বতসঞ্চয়
পিতা পুত্র একত্রিত সঙ্গে জ্ঞাতি চারিভিত
গিরিসম তুলিল নিলয়। [৮]

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের পর সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর 'রূপরাম' ও 'ঘনরাম চক্রবর্তী'র 'ধর্মমঙ্গল'-এ যে নগর জীবনের উল্লেখ আমরা পেয়েছি তা মূলত শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এখানেও রাজকরের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করার দিকটি বিবৃত হয়েছে। এই কাব্যের 'ঢকুর পালা'তে ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর মৃগয়া করতে গিয়ে বন্দী অবস্থায় 'সোম ঘোষকে' দেখতে পান। বন্দী করার কারণ হিসেবে জানা যায় রাজকর দিতে না পারায় 'মহামদ' তাকে বন্দী করে রেখেছিল –

বৎসব দিবস হৈল দুই পাত্র বেড়ি।
পঞ্চাশ কাহন কড়ি বৎসবের বাড়ি।।
পঞ্চাশ কাহন দিনু সাত কাহন কানা।
তার পাকে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা।। [৯]

আসলে কোন নগরকে রাজ্যশাসনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজা বা সামন্ত প্রভুর ক্ষমতা বাড়িয়ে আর্থিক, কর্মসংস্থানগত, খাদ্য-বস্ত্রের জোগান, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং বানিজ্যে নানাভাবে সম্বৃদ্ধশালী করে তোলা হয়। আর তা করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময় জনগণকে শোষণ করে একজন রাজা সামন্তপ্রভুর নিয়ন্ত্রণে সম্পদের একছত্র কেন্দ্রীকরণ চলত।

মোঘল শাসক বা অধিপতিরা মূলত বংশ পরম্পরায় একই কাজ করে যেতেন, তাদের কর্মের বিশেষ বৈচিত্র ছিল না। কিন্তু বঙ্গদেশে একজন মানুষের জীবৎকালের মধ্যে কর্মের বৈচিত্র তথা ভিন্নতা ছিল। কিন্তু সমাজের উচ্চশ্রেণী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই রাজা, জমিদার বা উর্ধস্তন আমলাদের তোষামোদ করে চলত বা বিশেষ তদ্বির করতে বাধ্য হত। আমরা জানি অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত মঙ্গলকাব্য 'অন্নদামঙ্গল' -এর লেখক ভারতচন্দ্র। তিনি (ভারতচন্দ্র) অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহন করলেও রাজরোষে তাঁদের সর্বশান্ত হতে হয়েছিল –

> ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার। তিনি বর্ধমান প্রদেশের ভুরসুট পরগনার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে বাস করতেন এবং সেই গ্রামেই ভারতচন্দ্রের জন্ম। গ্রামটি বর্তমানে হাওড়া জেলার অন্তর্গত। ভারতচন্দ্র পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বহুমুখী কর্মকুশলতা ও নিজ প্রচেষ্টায় সম্পত্তি অর্জন করায় মহারাজ তাঁকে রায় ও রাজা উপাধিতে সম্মানিত করেন। কিন্তু কোন এক সময়ে তিনি বর্ধমানাধীশ্বর কীর্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের মাকে কটুক্তি করায় তাঁর নির্দেশ বলে তাঁকে তাঁর সব কিছু হারিয়ে হত-দরিদ্রে পরিণত হতে হয়। ভারতচন্দ্র এই সময়ে অল্পবয়সী এক বালক মাত্র। [১০]

সর্বশান্ত হত-দরিদ্র হয়ে এরপর ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজিপুরের নিকটবর্তী অঞ্চল নওয়াপাড়ায় তাঁর মামার বাড়িতে চলে আসেন। মামারবাড়িতে এসে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র ব্যাকরণ ও অভিধান আয়ত্ত করেন। পরবর্তীকালে তিনি রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে ফারসী ভাষা শেখেন। এরপর তাঁর

জীবনের একটি বড় অংশ কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে কাটে। আমরা জানি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র যে নগরের বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেকটা তার নিজের ঘটনাবহুল ভ্রাম্যমান জীবনেরই অভিজ্ঞতা। ভারতচন্দ্রের পিতৃভূমি বর্ধমান। বর্ধমান ছাড়াও কবি তার ব্যক্তিগত জীবনের কটক, ফরাসডাঙা, কৃষ্ণনগর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে অন্নদামঙ্গলের কাঞ্চীর রাজপুত্র সুন্দর চরিত্রটির নগর দর্শনের অভিজ্ঞতায় ব্যবহার করেছেন। সুন্দর যখন বর্ধমান শহরে তার প্রেয়সী বর্ধমান রাজের কন্যা বিদ্যার সন্ধানে আসে তখন সুন্দরের চোখে পড়ে এই শহরের ঐশ্বর্যশালী রূপ –

চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলী বত্তিশ বাজার।।
থানে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুণ্ড নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে।।
ইরাকি তুরাকী তাজি আরবি জাহাজী।
হাজারে হাজারে দেখে থানে বান্দা বাজী।।
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষ জতেক সংসারে।। [১১]

নাগরিক জীবনের প্রাচুর্যের পাশাপাশি লোভ লালসাময় চাতুরির দিকটিও আমরা দেখতে পাই। হীরা মালিনি'কে সুন্দর বাজার করার জন্য দশ টাকা ও দু'টাকা দিলে দেখা যায় হীরা বাজারে মেকি তামার পয়সা, খুচরো পয়সার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে বাজারিদের বোকা বানায়। এমনকি বাজার সেরে ফিরে এসে সুন্দরকে দ্বিগুন জিনিসের দাম দেখিয়ে বেশিরভাগ টাকাই আত্মসাৎ করে।

শুনি তুষ্ট কবি রায়   দশ টাকা দিল তায়
দুটি টাকা দিল নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটা ভরা   হীরা পরধন হরা
বুঝিল এ মেনে আজবোজ।।
...
দিয়াছে যে কড়ি যার   দ্বিগুন শুনায় তার
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয়   এই যে উচিত হয়
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী ।। [১২]

আসলে মোঘল শাসন ব্যবস্থা থেকে যে মধ্যসত্ত্বভোগীদের জন্ম হয়েছিল সেই অত্যাচারের প্রবহমানতা মঙ্গলকাব্যের নগরজীবনেও নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তৎকালীন আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের বুনিয়াদি স্তরেই দাঁড়িয়ে আছে মঙ্গলকাব্যের নগর জীবন ও নগর রাষ্ট্রের চালচিত্র।

তথ্যসূত্র

১. অশ্রুকুমার সিকদার। 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়'। অরুনী প্রকাশনী। সপ্তম মুদ্রণ, কলকাতা,

বৈশাখ ১৪১১, পৃ. – ১১

২. গোলাম হোসেন সলীম। 'বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতিন)। প্রথম সোপান সংস্করণ। সোপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১, পৃ. – ১৪৪

৩. তেসলিম চৌধুরি। 'ভারতের ইতিহাস মুঘল যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ১৫০০ – ১৮১৮'। ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯, পৃ. – ৪২৯

৪. গোপাল হালদার। 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা'। চতুর্থ মুদ্রণ। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৪১২, পৃ. – ১৩১

৫. ড. দীনেশচন্দ্র সরকার। 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত'। প্রথম সংস্করণ। সাহিত্যলোক, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৬, পৃ. – ২২

৬. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.)। 'বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল'। দ্বিতীয় সংস্করণ। রত্নাবলী, কলকাতা, জুলাই ২০১৫, পৃ. – ৩৯২

৭. সুকুমার সেন (সম্পা.)। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল'। সপ্তম মুদ্রণ। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. – ৬৮

৮. সুকুমার সেন (সম্পা.)। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল'। সপ্তম মুদ্রণ। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. – ৭২

৯. শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল (সম্পা.)। 'রূপরামের-ধর্মমঙ্গল'। প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ। বর্ধমান সাহিত্য-সভা, বর্ধমান, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. – ৪০

১০. সুনীলকুমার ওঝা। 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল'। প্রথম পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্যলোক। কলকাতা, অক্টোবর ২০২১, পৃ. – ১১

১১. সুনীলকুমার ওঝা। 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল'। প্রথম পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্যলোক। কলকাতা, অক্টোবর ২০২১, পৃ. – ১০৯

১২. সুনীলকুমার ওঝা। 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল'। প্রথম পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্যলোক। কলকাতা, অক্টোবর ২০২১, পৃ. – ১১২

গ্রন্থপঞ্জি

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা.)। 'বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল'। দ্বিতীয় সংস্করণ। রত্নাবলী, কলকাতা, জুলাই ২০১৫

২. গোপাল হালদার। 'বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা'। চতুর্থ মুদ্রণ। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জৈষ্ঠ্য ১৪১২

৩. গোলাম হোসেন সলীম। 'বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতিন)। প্রথম সোপান সংস্করণ। সোপান পাবলিশার, কলকাতা, ২০১১

৪. জয়িতা দত্ত (সম্পা.)। 'পুরনো বাংলা সাহিত্য চিন্তা ও চর্চা'। প্রথম প্রকাশ। রত্নাবলী, কলকাতা,

ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫. ড. দীনেশচন্দ্র সরকার। ‘পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত’। প্রথম সংস্করণ। সাহিত্যলোক, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৬

৬. তেসলিম চৌধুরি। ‘ভারতের ইতিহাস মুঘল যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ১৫০০ – ১৮১৮’। ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯

৭. রেজওয়ানুল ইসলাম (সম্পা.)। ‘প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য’। প্রথম প্রকাশ। বুকস্ স্পেস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২

৮. শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল (সম্পা.)। ‘রূপরামের-ধর্মমঙ্গল’। প্রথম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ। বর্ধমান সাহিত্য-সভা, বর্ধমান, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

৯. সুকুমার সেন (সম্পা.)। ‘কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল’। সপ্তম মুদ্রণ। সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

১০. সুনীলকুমার ওঝা। ‘রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল’। প্রথম পুনর্মুদ্রণ। সাহিত্যলোক। কলকাতা, অক্টোবর ২০২১

লেখক পরিচিতি :

দেবার্ক মণ্ডল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে পিএইচ.ডি করেছেন। পছন্দের বিষয় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন। বর্তমানে ঠাকুরপুকুর ‘বিবেকানন্দ কলেজ’-এর অতিথি অধ্যাপক।